ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)

গবেষক

আজহারুল মিদ্দা

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0402717

রেজিস্ট্রেশন তারিখ: 12/12/2017

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

প্রফেসর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

ভূমিকাঃ-

পুঁজিবাদী শাসন গড়ে উঠেছিল সকল শ্রেণীর শ্রমিককে শোষণ করার ফলে। এই শ্রমিক সম্প্রদায়কে শোষণ করার জন্য উনবিংশ শতকে ইউরোপে ক্রমান্বয়ে শ্রমিক আন্দোলন হতে দেখা গিয়েছিল। উপনিবেশ স্থাপনের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে এই শ্রমিক আন্দোলন ভারতবর্ষেও দেখা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে বহু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল যেমন পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লা খনি শিল্প, চা-বাগিচা শিল্প ইত্যাদি। এই শিল্পগুলি ছাড়াও উনবিংশ শতকে ব্যবসা-বানিজ্যের উন্নতি সাধিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে স্থলপথে রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে এবং জলপথে বন্দরগুলি উন্নতমানের করা হয় যাতে করে জাহাজ, বোট, স্ট্রিমারের মধ্যদিয়ে ব্যাপকভাবে আমদানি-রপ্তানি করা যেতে পারে, এরই সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ তৈরি শিল্পের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই শিল্প এবং কল-কারখানাগুলি সচল রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। এই শ্রমিকগণ মূলত গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবার এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছিল। অনেক বেকার যুবক অভাবের তাড়নায় রুজি রোজগারের জন্য শিল্প এবং কল-কারখানায় শ্রমিক হিসাবে নাম লিখিয়েছিল। এই শ্রমিকদের পাশাপাশি জলপথে জাহাজকে কেন্দ্র করে পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য এবং অন্যান্য কার্য পরিচালনার জন্য নাবিক নিয়োজিত হয়েছিল। এদের জীবনযাত্রা এবং কর্মপদ্ধতি আর অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে অনেকটায় কষ্টকর ছিল। এই নাবিকরা বছরের বেশিরভাগ সময়টায় পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলপথে জাহাজের মধ্যে অতিবাহিত করত। নাবিকদের শ্রমিক রূপে জাহাজে বিভিন্ন প্রকার কাজ কর্মের মধ্যদিয়ে তাদের কর্মসম্পাদন করতে হত। শিল্প কারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে শ্রমিক শ্রেণী এবং জাহাজকে কেন্দ্র করে নাবিক শ্রেণীর রুজি রোজগারের সুবন্দোবস্ত হলেও পরবর্তীকালে এদের আর্থসামাজিক দিকটি অবহেলিত হতে থাকে। এরফলে শ্রমিক এবং নাবিকদের মধ্যে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষের কারণে উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে বিংশ শতকে দ্বিতীয় দশকের মধ্যে শ্রমিকরা এবং নাবিকেরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে ১৯২০ সালে শ্রমিক এবং নাবিকদের স্বার্থে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) গড়ে ওঠে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের একছত্রে আনতে সক্ষম হয়েছিল। রেলওয়ে শ্রমিক, চটকল শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিক, শিল্প শ্রমিক, চা-বাগিচা শ্রমিক, খনি শ্রমিক, ট্রামওয়ে শ্রমিক, বিভিন্ন প্রকার কারিগরি শ্রমিক, বন্দর শ্রমিক এবং জাহাজে

নিয়োজিত নাবিক শ্রমিকগণও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে (AITUC) যোগদান করেছিল।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ-

১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ই. পি. থমসন এবং এরিক হবসবম শ্রমিকদের ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিকে দেখাতে চেয়েছেন। থমসন সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক শ্রেণীকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর *"The Making of the English Working Class"* - এই বইয়ের মাধ্যমে। এই সকল মহান ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় সনৎ কুমার বসু, নির্বাণ বসু, রণজিৎ দাশগুপ্ত, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, অমিয়কুমার বাগচি, শুভ বসুর মতো ঐতিহাসিকগণ শ্রমিকদের ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তনিকা সরকার এবং শমিতা সেন নারী শ্রমিক ইতিহাসকে একটি নতুন আঙ্গিকে রূপ দান করেছেন।

বাংলাতে শ্রমিকদের নিয়ে যেমন পাটশিল্প শ্রমিক, কার্পাস বস্ত্র শ্রমিক, চা-বাগিচা শ্রমিক, খনি শ্রমিক, রেলওয়ে শ্রমিক, ট্রামওয়ে শ্রমিক, চটকল শ্রমিক, নারী শ্রমিক প্রভৃতি নিয়ে গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাতে নাবিক শ্রমিকদের নিয়ে গবেষণা সেভাবে আলোচিত হয়নি যদিও রজত রায় এবং সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় বাংলাতে Seamen's Union এর গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন তবে এটা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ফারহিন খানাম বাংলার নাবিক এবং Indian Seamen's Union এর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে একটি অপ্রকাশিত লেখার মধ্যদিয়ে বাংলার নাবিকদের নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন মূলত লেখাটির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলকাতার নাবিকদের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যদিও সমগ্র বাংলার নাবিকদের নিয়ে সেভাবে আলোচনা হতে দেখা যায়নি। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার নাবিকদের নিয়ে সেভাবে কোনো গবেষণার কাজ হয়নি।

বাংলাতে এক প্রকার শ্রমিক আমাদের চোখের আড়ালে জাহাজের মধ্যে নিরলস এবং অবিরত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিল। তাদের সংগ্রামী জীবনধারা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যদিও তাদের এই আন্দোলনের পথ সহজ ছিল না। ঔপনিবেশিক ভারতে ১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের (AITUC) প্রতিষ্ঠা শ্রমিকদের কাছে একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত এবং এই একই সময়ে ইতালির জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ILO) গঠিত হয়েছিল। যেখানে বাংলার নাবিক সংগঠন যা "Indian Seamen's Union" নামে পরিচিত, এই নাবিক সংগঠনের সদস্যরাও এই

ইউনিয়নে যোগদান করার মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উপরিউক্ত ঘটনাগুলি আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় এবং এই সময়কাল অর্থাৎ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ আমার কাছে যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তাই উক্ত সময়কালটিকে আমি আমার গবেষণার সূচনাকাল নির্ধারণ করার জন্য মনস্থির করেছি। ১৯৪৭ সাল হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ ঘটেছিল। শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সঙ্গে জাহাজের মধ্যে কর্মরত বাংলা সহ ভারতের নাবিকেরাও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক আচারণ, শাসন এবং শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। তাই এই সময়কালকে আমি আমার গবেষণার অন্তিম পর্ব হিসাবে পরিগণিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

গবেষণা প্রশ্নঃ-

গবেষণা কার্যটি চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় আমি কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এই প্রশ্নগুলি হল নিম্নরূপ –

১) বাংলার নাবিক কারা ছিল? আবার এদেরকে কেন লস্কর বলা হত?

২) বাংলার লস্করদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি কিরূপ ছিল?

৩) কেন তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে দেশান্তরিত হয়েছিল?

৪) কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা বাংলার লস্কররা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল?

৫) কেন তারা সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল এবং ইউনিয়ন গঠন করেছিল?

৬) লস্কররা জাহাজে নিত্যদিন প্রতিকূল অবস্থায় কাজের মধ্যদিয়েও কীভাবে তাঁদের বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পেয়েছিল?

গবেষণা বিষয় সম্পর্কিত স্বল্প বিস্তার আলোচনাঃ-

'নাবিক' কারা? বিশেষত জাহাজে যারা কাজ করে তাদের আমরা নাবিক বলে চিনি বা জানি। কিন্তু এই সংজ্ঞা গবেষণা কার্যের জন্য যথোপযুক্ত ধারনা দিতে পারে না। এখানে নাবিক বলতে যা বোঝায়, যে সকল কর্মী জাহাজের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত থাকে এবং দীর্ঘদিন পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে জাহাজের বিভিন্নধরনের কার্যাবলী পরিচালনার মধ্যদিয়ে জীবন আতিবাহিত করে। এই নাবিকদের কাজের ক্ষেত্রে অনেক প্রকারভেদ ছিল। উচ্চপদস্থ জাহাজ চালক (সারেং) থেকে শুরু করে একেবারে নিম্নপদস্থ কর্মী প্রত্যকেই সচেতনভাবে এবং দক্ষতার সহিত নিজেদের কার্যসম্পন্ন করত। আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়

হল ‘বাংলার নাবিক’। বাংলাকে কেন্দ্র করে যে সকল নাবিক জাহাজে কার্যনির্বাহ করেছিল তাদের জীবন তথা কাজের প্রতিটা পদক্ষেপ মসৃণ ছিল না। নানান উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে বাংলার নাবিক শ্রেণী জাহাজের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিল। বাংলার নাবিকদের ‘লস্কর’ (Lascar) ও বলা হত। এই ‘লস্কর’ কথাটি আরবি শব্দ al’askar থেকে এসেছে, যার অর্থ হল সৈনিক। পর্তুগিজরা এই শব্দটিকে ‘Lasqurin’ নামে ব্যবহার করত। অষ্টাদশ শতকে দেশীয় সৈনিকরা যারা জাহাজের মধ্যে থাকত তাদের ‘লস্কর’ বলা হত। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ জাহাজে যে সকল নাবিকরা কাজ করত তাদের ‘লস্কর’ নামে ডাকা হত। জাহাজের কাজের সঙ্গে বাংলার নাবিকরা সংযুক্ত থাকার জন্য বাংলার নাবিকদেরও ‘লস্কর’ বলা হত।

কেন বাংলার নাবিকগণ সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় জাহাজকে কেন্দ্র করে বাংলার নাবিকগণের রুজি রুটির ব্যবস্থা হলেও পরবর্তীকালে তাদের মজুরী, স্বাস্থ্য, শ্রমের নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর কর্তৃপক্ষ নজর প্রদান করেন নি। এই বিষয়গুলির কারণে নাবিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় তাদের মনে প্রতিবাদ স্পৃহা জাগলেও কাজ হারানোর ভয়ে তারা আন্দোলন গড়ে তোলার সাহস করে উঠতে পরে নি। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাহাজে কাজ কর্ম করা খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। যে সকল নাবিক জাহাজে কাজ করতে যেত সে যে আবার স্বদেশে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। বিভিন্ন প্রকার দালাল শ্রেণী জাহাজে নাবিকের কাজ পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে ভারত থেকে বিদেশে বহু সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাস হিসাবে পাচার করে দিত। জাহাজে করে যখন তাদের নিয়ে যাওয়া হত তখন সে জাহাজে সাধারণ মানুষের আধিক্য জনিত কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনাহারে মারা যেত আবার অনেকে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করত। এই সকল দরিদ্র নিরুপায় মানুষদের জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে কোনো দ্বীপে বা কোনো দেশে স্থানান্তরিত করে সেখানে তাদের দাসেদের ন্যায় শ্রম করানো হত। এদের দৈনন্দিন কাজের সময়সীমা ছিল ১২-১৩ ঘণ্টা। জাহাজে নাবিকের কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এত সকল বাধা বিপত্তি সত্বেও বাংলার বহু মানুষ জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল। নাবিকেরা বন্দর এলাকায় দালাল মারফৎ ঘুস দিয়ে জাহাজে নাবিকের কাজে অংশগ্রহণ করত। যাদের নিকটস্থ ব্যক্তি জাহাজে কাজ করত তাদের কোনো দালালদের চক্রে পড়তে হত না, তারা আত্ম-পরিজনের হাত ধরে বিনা বাধায়

জাহাজের কাজে নিয়োজিত হত। 'ঘাট-সারেং' জাহাজে নাবিক নিয়োগের প্রধান দায়িত্বে থাকত, এরাই আবার জাহাজে কত সংখ্যক নাবিক নিয়োজিত হবে তা দেখাশোনা করত। জাহাজের কাজে নিয়োজিত হবার সময় নাবিকদের একটি বিষয় মাথায় রাখতে হত যে যাত্রার সময় জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়ার পূর্বে অগ্রিম ভাবে এক মাসের বেতন ঘাট-সারেংকে দিতে হবে এই শর্তে রাজি থাকতে হত।

নাবিক সংগঠন কীভাবে গড়ে ওঠেছিল? থিয়ডর মাজারিলোর তথ্য থেকে জানতে পারি ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ার নাবিকদের দ্বারা একটি 'গোয়া-পর্তুগিজ সীমেন্স ক্লাব' গড়ে উঠেছিল এটাকেই প্রথম নাবিক সংগঠন হিসাবে ধরা হয়। বাংলার কলকাতাতে প্রথম ১৯০৮ সালে একটি নাবিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল যার নাম হল 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান'। এই ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্যগণ সমুদ্রযাত্রার কারণে প্রায়ই অফিসে অনুপস্থিতি থাকার জন্য এই ইউনিয়ন দীর্ঘদিন যাবৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। যদিও ইতিপূর্বে এস. মোঘল জান নামক এক ব্যক্তি নবাব সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী C.I.E., খান বাহাদুর এদের সহায়তায় ঐ একই নামে ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বর্ধিত বেতন, অসামঞ্জস্য বেতন রদ এবং ভারতীয় নাবিকদের প্রাণহানীর ক্ষতিপূরণের দাবিতে আর. ব্রাউন্ডফিল্ডের নেতৃত্বে ১৯১৮ সালে মহম্মদ দাউদ, এস. মোঘল জান, ডক্টর এ. এইচ. জাহির আলা প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহায়তায় নিষ্ক্রিয় 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান' পুনর্জীবিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন' নামে গঠিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালে মানফুর খানের উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন' নামে আরও একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯২১ সালে এই ইউনিয়নটি ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলন্ট ইউনিয়নের সঙ্গে মিশে গিয়ে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন নামে পরিচিতি লাভ করে।

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে জাহাজের মাধ্যমে বহির্দেশীয় ব্যবসা-বানিজ্যের অধিকাংশটাই ব্রিটিশরাই দেখাশোনা করত। এই জাহাজগুলিতে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় নাবিকের অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। "*We Ask for British Justice": Workers and Racial Difference in Late Imperial Britain* লোরা তাবিলির এই বইয়ে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ নাবিকদের একই যোগ্যতা থাকা সত্বেও জাহাজে কর্মের ক্ষেত্রে, যেমন জাহাজে বসবাস, খাওয়া দাওয়া এবং আচার ব্যবহারে ভারতীয় নাবিকরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল ব্রিটিশ নাবিকদের দ্বারা। এই বিষয়গুলির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণ ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ঔদ্ধত্যমূলক ব্যবহার

শ্রমিকদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। এইজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ সংগঠিত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ ইতালির জেনেভাতে ১৯২০ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ILO) গড়ে উঠেছিল। এই সম্মেলনে বাংলার নাবিকদের সংগঠনের নির্বাচিত কিছু সদস্যগণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে (ILO) যোগদান করেছিল।

১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের (AITUC) গঠন ভারতের সকল প্রকার শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই ইউনিয়ন একদিনে গড়ে ওঠেনি, বহু শ্রমিকের বহু আন্দোলন, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও প্রতিবাদের ফলস্বরূপ শ্রমিকদের একটি সংঘবদ্ধ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল পরবর্তীকালে এটিই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন (AITUC) রূপে বহিঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে নিয়ে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্বে বিভিন্ন প্রকার কম বেশি শ্রমিক সংগঠন নিয়ে ভারতবর্ষে ছোট, বড়ো আকারের ইউনিয়ন গজিয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল এবং এই ইউনিয়নগুলি ১৯২০ সালে শ্রমিকদের বৃহত্তর স্বার্থে মিলিত হয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন (AITUC) গঠন করেছিল।

গবেষণা পদ্ধতিঃ-

গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে গেলে প্রাথমিক উপাদান এবং সহায়ক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। প্রথমত প্রথমিক উপাদানগুলি সন্ধান করে বের করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস, কলকাতা, এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, কলকাতা, (এটি ঐতিহ্যবাহী মেরিটাইম আর্কাইভস) ইত্যাদি মহাফেজখানাগুলিতে সংরক্ষিত ফাইলগুলি অনুসন্ধান করে গবেষণা কাজে উপযুক্ত তথ্যগুলির সাহায্য অবলম্বন করতে হবে। এছাড়াও গবেষণার কাজকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুরাতন পত্র-পত্রিকা, গবেষণা সম্পর্কযুক্ত পুস্তক ও পুস্তিকার সাহায্য নিতে হবে। বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তি যার বংশের কোনো সম্পর্কিত পূর্ব পুরুষগণ পূর্বে কোনো জাহাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের মধ্যদিয়ে গবেষণা সম্বন্ধীত তথ্য দিয়ে গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নিরলস প্রচেষ্টা করতে হবে।

অধ্যায় বিন্যাসঃ-

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭) শিরোনামের আমার গবেষণা সন্দর্ভের মূল আলোচনার ক্ষেত্রটি ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত মূলত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। অধ্যায়গুলি হলঃ

১। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের ইতিহাস।

২। ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক স্বার্থে সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়া ও তার কার্যাবলী।

৩। বাংলার নাবিকদের বহির্বিশ্বে অভিগমনের মধ্যদিয়ে অভিবাসন লাভ এবং পরবর্তীকালে স্বদেশে আগত অভিবাসী নাবিকদের বিদেশে কর্মসম্পাদনে স্মৃতিচারণা।

৪। বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন, সমাবেশ ও ধর্মঘট (১৯২০-১৯৪৭)।

৫। বাংলায় নদীকেন্দ্রিক ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে কলকাতা বন্দরের উত্থান এবং এর বাণিজ্যিক কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়ে কলকাতা শিল্প নগরীর পত্তন ঘটেছিল। এই বিষয়টি বরুণ দে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৩৫ তম বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর বাংলার হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে যে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে পাটকল এবং বস্ত্রকল ছিল অন্যতম এই কারখানাগুলি শ্রমিকদের আকর্ষণীয় কর্মস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারখানা শ্রমিকদের সঙ্গে শহর কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকার নির্মাণশৈলী, বন্দর ও সেতু নির্মাণে ব্যাপক সংখ্যক ঠিকা শ্রমিকের অবস্থানও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কলকাতা বন্দরের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরটিও কলকাতা বন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জলপথে বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যকে চালিত করেছিল। বাণিজ্যিক কাঁচামালগুলি হুগলী নদী তীরবর্তী শিল্প সমৃদ্ধ শহর কলকাতার কল-কারখানাগুলিতে জোগান দেওয়া ও সেখান থেকে শিল্পজাত পণ্য সামগ্রীগুলি বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারজাত করার জন্য নদীপথে স্টিমার, বোট এবং সমুদ্রপথে বৃহত্তর জাহাজগুলির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কলকাতা এবং চট্টগ্রাম এই দুটি বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলিতে বাংলার নাবিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এদের চলন্ত ভাসমান জাহাজের ইঞ্জিন রুম, অফিস ঘর রক্ষক, রান্নার কাজ, খাদ্য পরিবেশন ও চুল্লিতে কয়লা ঠেলার মত ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রগুলিতে কর্ম সম্পাদন করতে দেখা গিয়েছিল। বাংলার এসকল নাবিকেরা শ্রমিক রূপে জাহাজে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে অধিকাংশ জাহাজগুলি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রাধীনে থাকায় জাহাজে কর্মরত নাবিকেরা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি শক্তির দ্বারা শোষিত এবং নিপীড়িত হয়েছিল। বিংশ শতকের

গোঁড়ার দিকে বাংলায় ***ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU)*** গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল যা ১৯২০ সাল নাগাদ সার্বিকভাবে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বাংলার নাবিকেরা এই ইউনিয়নটিকে অবলম্বন করে সমাবেশ, ধর্মঘট এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তি এবং দেশীয় মুনাফাখোর দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছিল। এরই মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ বাংলার বহু নাবিকদের জীবন এবং তাদের কর্মপন্থা ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছিল ফলে বহু নাবিক দেশান্তরিত হয়ে তাদের জীবন কাটিয়েছিল আবার অনেক সময় মহাসমুদ্রে শত্রুপক্ষের আক্রমণে সলিল সমাধি হয়ে জীবন বিসর্জিত করেছিল। বাংলার হতাহত নাবিকদের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সীমেন্স ইউনিয়ন তাদের পরিবারের প্রতি ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিল। এই ইউনিয়নটি নাবিকদের নিরাপত্তা, উপযুক্ত বেতন, ভাতা, কাজের সময়সীমা এবং কর্মবিরতির উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের সংগঠিত করেছিল। এখানে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধাগুলি পাওয়া মূল লক্ষ্য ছিল না। এদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে দলগত রাজনৈতিক ভাবাবেগ অন্তর্নিহিত ছিল তাই এদের সংগ্রামী আন্দোলনগুলি ঔপনিবেশিক শাসনকে অবসানের দিকে ধাবিত করেছিল। বাংলার নাবিকদের সংগঠিত রূপে তাদের সংগ্রামী চেতনার আত্মপ্রকাশ ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল যা আমার গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয়।